রামকৃষ্ণোপনিষদ

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

বেদ আমাদের শাস্ত্র। এর অন্তভাগ উপনিষদ। জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞান অর্থে আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান; বস্তুবিষয়ক জ্ঞান নয়। অধ্যাত্মতত্ত্ব বা সত্য অত্যন্ত গূঢ়, সাধনসাপেক্ষ। গুরুসমীপে স্থিত হয়ে আস্তিক্য বুদ্ধি নিয়ে শারীরিক ও মানসিক শ্রম, আন্তরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও দৈবী মেধা সহকারে এই জ্ঞান আয়ত্ত করতে হয়। উদ্দেশ্য—ভববন্ধন খণ্ডন বা মুক্তি।

উপনিষদের শ্লোকগুলিকে মন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। এগুলি 'Revealed Truth', সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের ধ্যানে এই মন্ত্রগুলি উদ্‌ভাসিত হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, এর উৎস কী বা কোথায়? উত্তর—চৈতন্যসত্তায় বা ব্রহ্মসত্তায়; যে-সত্তার সঙ্গে ধ্যানযোগে একাত্মতা লাভ করে এই চিরন্তন সত্যগুলি ঋষিদের শুদ্ধ, পবিত্র চিত্তে প্রকাশিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে কোনও ঋষিকল্প ব্যক্তিই এগুলির প্রতি সংশয় প্রকাশ করেননি, বা বর্জন করেননি অসত্য বলে। উপরন্তু এঁদের উপলব্ধ সত্য বা মন্ত্রগুলির সঙ্গে পূর্বের বা পরবর্তী কালে প্রাপ্ত মন্ত্রের কোনও বিরোধও দৃষ্ট হয় না।

বিজ্ঞানের জগতে আবিষ্কৃত তথ্য বা সত্যগুলি আপতিক (Empirical) অর্থাৎ জাগতিক অভিজ্ঞতা প্রসূত; পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ওপরে নির্ভরশীল এবং পরবর্তী কালে তা নাকচ হতে পারে বা হয়েছেও। এখন আইনস্টাইনের যুগান্তকারী আবিষ্কার Relativity Theoryও প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে Theory বা মতবাদগুলি Relative Truth, আপেক্ষিকভাবে সত্য; Absolute বা শাশ্বত সত্যের মর্যাদায় প্রায়শই উন্নীত হতে পারে না। কারণ বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি। নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কার বা উন্নততর প্রযুক্তি, অধিকতর বৈজ্ঞানিক মেধা সহায়ে আবিষ্কৃত তথ্যের বিপরীতও কালে আবিষ্কৃত হতে পারে, বা তার সম্ভাবনাও অন্তত স্বীকার করে নিতে হবে। বহিঃপ্রকৃতিকে কেউই সম্পূর্ণরূপে 'explore' করতে পারে না। যে causal nexus বা কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলি গড়ে ওঠে, সেই কার্যকারণ সম্পর্ককে ঠিক ঠিক জানা অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট কারণেই একটি নির্দিষ্ট কার্য ঘটছে, এটি আবিষ্কার করা একেবারেই দুঃসাধ্য ব্যাপার, কারণ অভিজ্ঞতায়—পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের মাধ্যমেও বহুকারণবাদের সম্ভাবনাকে অতিক্রম করা যায় না।

আমরা বিস্মিত হই যখন দেখি যে বিভিন্ন

উপনিষদের মন্ত্রগুলি একই সত্যকে নানাভাবে ব্যক্ত করছে এবং তাদের মধ্যে আশ্চর্যরকম ভাবের সাদৃশ্য বা মিল রয়েছে। এমন কথা ভাবা যায় না যে বিভিন্ন ঋষিরা একই স্থানে বসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অপরোক্ষ জ্ঞানগুলিকে ব্যক্ত করেছেন ও তাদের সাদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন, গ্রিসের সমকালীন দার্শনিকদের মধ্যে প্রথমদিকে যেমন আলোচনার রেওয়াজ ছিল বলে পড়েছি। আমাদের ঋষিরা সকলেই সমকালীন বা সমস্থানীয়, এমনটিও ভেবে নেওয়া যাবে না। এখনকার মতো তৎকালে যোগাযোগব্যবস্থাও ছিল কল্পনার অতীত। অথচ বিভিন্ন উপনিষদে একই সত্য বা তত্ত্ব পাচ্ছি, যাতে কোনও সংশয়ের অবকাশই থাকছে না। এমন কথা অবশ্য ভাবা যেতে পারে যে, একই গুরুগৃহে যাঁরা সতীর্থ হয়ে পাঠগ্রহণ করছেন তাঁদের মধ্যে সমচিন্তা প্রবেশ করানো হয় এবং তাঁরা সকলেই আজকের পরিভাষায়, সদৃশচিন্তার একটি 'network' তৈরি করে ফেলে পরবর্তীতে একই তত্ত্ব ব্যক্ত বা প্রচার করেছেন। কিন্তু প্রথমকথা, বিষয়জ্ঞানের মতো পারমার্থিক জ্ঞান শুধুমাত্র পাঠ প্রবচনের মাধ্যমেই আয়ত্ত করা যায় না, এটি দীর্ঘকালীন সাধনসাপেক্ষ। কায়িক, মানসিক ও বাচনিক তপস্যা চাই। দৈহিক কৃচ্ছ্রতা, ত্যাগবৈরাগ্য, সত্যনিষ্ঠা, ঐকান্তিক ঈশ্বরানুরাগ, ব্যাকুলতা চাই ঈশ্বরপ্রণিধান বা ব্রহ্মানুভূতির জন্য। এগুলির কোনওটিই বাইরে থেকে গুরুর উপদেশমাত্র বা পাঠদানে হতে পারে না; আত্মোন্নতির ক্রমবিকাশের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়।

এই প্রবন্ধে যে-উপনিষদটি আলোচিত হবে এবং যাঁর নামে এটি চিহ্নিত হয়েছে, সেই বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে কিছু গৌরচন্দ্রিকা করা গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ঊনবিংশ শতকে বঙ্গদেশের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের বিপর্যয়ের পটভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। এক অখ্যাত অজ পল্লির দরিদ্র ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান, পিতার মৃত্যুর পর বড়দাদার হাত ধরে পৌরোহিত্যে হাতেখড়ির জন্য কলকাতার টোলে সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন, পরে দাদার নির্দেশেই দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণির নবপ্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে কিশোর গদাধর চট্টোপাধ্যায় এসে হাজির হন। পরে দাদার অবর্তমানে রাসমণি ও মথুরবাবুর আগ্রহাতিশয্যে মন্দিরে মা কালীর পূজারির পদ গ্রহণ করেন, যদিও প্রথম থেকে তিনি এ-পথে আসার বিরোধীই ছিলেন। পরবর্তীতে শুধুমাত্র বিধিবদ্ধ পূজা-অর্চনাতেই তৃপ্ত না হয়ে জগন্মাতার সাক্ষাৎ দর্শনলাভের জন্য তীব্রভাবে ব্যাকুল হন ও সুদীর্ঘকাল ওই স্থানেই—গঙ্গাতীর ও দেবালয় সংলগ্ন প্রাঙ্গণে তপস্যামগ্ন হয়ে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার করেন। গৃহত্যাগ নয়, গিরিগুহা নয়, নিতান্ত শহর থেকে দূরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনহীন বন বা অরণ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালেও সে-সাধন সংঘটিত হয়নি—যে-সাধনার ধারা তাঁর পূর্ববর্তী কোনও ঈশ্বরদর্শনকারী সাধকের জীবনে তো একান্ত অভাবনীয় ছিলই, পরেও কেউ ওইভাবে সাধনায় অগ্রসর হননি। আরও যেটি আমাদের বিস্মিত করে তা হল, তিনি ওই তপস্যাতেই তাঁর উদ্দিষ্ট জগন্মাতার সাকার দর্শন তো পেলেনই, উপরন্তু একইসঙ্গে নিরাকার নির্গুণ, সর্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্যেরও তাঁর প্রত্যক্ষ হল জ্যোতির সমুদ্ররূপে, যা তাঁকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলল সাকার থেকে নিরাকারের উপকূলে। উপলব্ধি করলেন, যিনি নির্গুণ নিরাকার, তিনিই সগুণ সাকার, কোনও বিরোধ নেই। অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে এই যুগ্ম দর্শন করে তিনি যেন এক চিরকালীন 'record' স্থাপন করেছেন, যা তাঁর পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোনও ঈশ্বরদর্শনকারী সাধকের জীবনে ঘটেছে বলে শোনা যায়নি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনকালের শেষ পর্যায়ে কয়েকটি বছর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সাধকগণ—রামায়েত সন্ন্যাসী, বেদান্তী তোতাপুরীজী, বৈষ্ণব ও শাক্তসাধক, তন্ত্রসাধিকা ভৈরবী ব্রাহ্মণী—প্রমুখ তাঁর সান্নিধ্যে আসেন। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' থেকে জানতে পারি ওইসব বরেণ্য সিদ্ধ সাধকগণও এই নবীন তাপসের কাছ থেকে তাঁদের নিজ নিজ সাধনমার্গ সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান ও উদ্দীপনা নিয়ে উচ্চতর অবস্থা লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবৎকালের শেষ পাঁচ-ছয় বছর মাত্র তাঁর ভক্ত অনুরাগিবৃন্দ তাঁর দিব্যসান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে গৃহী ভক্তরাই প্রথমদিকে এসেছেন। যাঁরা তাঁর যথার্থ বার্তাবহ হবেন, সেইসব কিশোর ও যুবকগণ পরে উপস্থিত হয়েছেন এই অনুপম গুরুর মহিমময় জীবনাদর্শের আলোকে নিজেদের জীবন ও কর্ম স্থির করে জগতে এক অভিনব ধর্মাদর্শ স্থাপন করতে—যেখানে ধর্ম ও কর্ম, অধ্যাত্মসাধনা ও সাংসারিক কর্তব্য, ঈশ্বর ও ব্যাবহারিক জগৎ উভয়কেই এক সূত্রে সমন্বিত করে লোককল্যাণ ব্রতে জীবন উৎসর্গ করতে এবং এক নতুন পথ দেখাতে সমর্থ হবেন।

ওইকালে রামকৃষ্ণদেবের কাছে আগত ভক্তদের অবগতির জন্য বর্ষিত তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীগুলি বা ধর্মীয় উপদেশাবলি সংগৃহীত ও একত্রিত করে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন তাঁরই একনিষ্ঠ গৃহী ভক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ প্রধানত তিনটি কারণে—এক, এর Photographic details, দুই, শ্রীঠাকুরের অনন্য বাক্যগুলি উপমাসহ অবিকৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে, ও তিন, লেখক নিজেকে একেবারে অন্তরালে রেখে দিব্য জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বটিকেই আলোকিত করতে সমর্থ হয়েছেন। শ্রীমা সারদা দেবীকেও এই গ্রন্থখানি পাঠ করে শোনানো হলে তিনি পরমানন্দ লাভ করেন ও বলেন ঠিক ঠিক কথাগুলিই তোলা হয়েছে।

'কথামৃত' গ্রন্থটির পাতায় পাতায় যেন অজস্র দিব্যভাবের মণিমুক্তা ছড়িয়ে আছে এবং তারই সহকারী বাস্তবানুগ উপমা, সরল ও সরস ভাষার সৌকর্য ও সংক্ষিপ্ততা, মর্মার্থের গভীরতা, এইসব বাণীগুলিকে উপনিষদের মন্ত্রেরই মর্যাদা দান করেছে বললে একটুও অত্যুক্তি হয় না। স্বামীজী বলেছেন, উপনিষদের মন্ত্রগুলি কবিতার মতো। উপনিষদ কাব্যগুণে ভরপুর, কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলির মূল্যায়নেও এই গুণ আরোপ করা চলে। সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রামকৃষ্ণদেবকে 'কবি' আখ্যাই দিয়েছেন। ভক্তদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গের সময় সামান্যমাত্র দিব্যভাবের উদ্দীপনে সমাধিতে বা আত্মচৈতন্যের গভীরে মগ্ন হয়ে যাওয়া ও সেখান থেকে বাস্তবপ্রেক্ষিতে ফিরে আসার কালে ওই রত্নাকর ভাবসমুদ্রের অতল থেকে দুর্লভ কিছু মণিমুক্তো তুলে আনা ও তা বিতরণ করা—এ-ঘটনার প্রায়শই সাক্ষী থেকেছেন তাঁর দক্ষিণেশ্বরের ওই ছোট্ট ঘরটিতে উপবিষ্ট অনুরাগিবৃন্দ। যেমন একদিন ভক্তসমীপে শ্রীচৈতন্যদেবের সাধনপথ, জীবে দয়া, বৈষ্ণবপূজন এসব প্রসঙ্গ করতে করতেই সহসা তিনি সমাধিতে ডুবে গেলেন। স্বামীজী—তৎকালে নরেন্দ্রনাথ—ঠিক সেই সময়েই ওই ঘরে প্রবেশ করে শুনলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ অর্ধনিমীলিত দৃষ্টি ও হাস্যময় মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করে বলে উঠলেন, ''জীবে দয়া করবার তুই কে? জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা!'' নরেন্দ্রনাথের চোখের সামনে সহসা যেন এক নবচিন্তার আলোকোজ্জ্বল দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে গেল; সূচিত হল নবযুগের এক নবধর্মপথ, ঘোষিত হল নবজাগরণের মন্ত্র, যে-মন্ত্র মানবজীবন প্রসারণের মন্ত্র, যে-মন্ত্রে বিশ্বব্যাপী সেবাযজ্ঞের, রামকৃষ্ণ মিশনের যেন দ্বারোদ্ঘাটন

হয়ে গেল। অপরের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্যে আত্মপ্রসাদ (আত্মতৃপ্তি অর্থে) আছে, কিন্তু আত্মপ্রসার নেই। নিজে শিববোধে জাগ্রত হয়ে অন্যদেরও সেই বোধে জাগিয়ে তোলা নিষ্কাম ভালবাসা ও সেবা দিয়ে—এরই নাম আত্মপ্রসারণ। শ্রীশ্রীমাও এই মন্ত্র আমাদের শুনিয়েছেন : 'জগতে কেউ পর নয় মা', স্বামীজীও এই অনুভূতিতে আরূঢ় হয়েছেন : 'সকলেতে আমি, আমাতে সকল'। সেদিন রামকৃষ্ণদেবের মুখে উচ্চারিত 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র এই মন্ত্রটি শুধু বিশ্বাসবলে নয়, যুক্তির হাত ধরেই এক আশ্চর্য অভিঘাতে নরেন্দ্রনাথের বিচারপ্রবণ মনে যেন এক ভাবনার তরঙ্গ সৃষ্টি করল—'যদি ভগবান দিন দেন তো একথার সত্যতা তিনি তুলে ধরবেন জগতসমক্ষে'। গুরুকৃপায় সে-কাজ করতে যে তিনি সম্পূর্ণভাবে সক্ষম হয়েছিলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঠাকুরের ওই বাণীটি ছিল আত্মচেতনার গভীরতর স্তর থেকে তুলে আনা এক নতুন তত্ত্ব, যা পূর্বে অশ্রুত, অনধিগত ছিল এবং যা আগামী যুগের প্রেক্ষিতের সঙ্গে সুসমন্বিত হতে কোনও বাধা তো রইলই না, উপরন্তু সর্বপ্রকার কর্মভাবনাকে উচ্চ ধর্মভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ায় ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রজীবন—সবেরই উত্তরণ ঘটার সম্ভাবনা তৈরি হল।

এই ধরনের কত যে টুকরো টুকরো দিব্যবাণীর ঝলক আমাদের অভিভূত করে দেয়, আমাদের চেতনাকে নাড়া দিয়ে যায়, পুরাতন ভাবনা-চিন্তার সংস্কারসাধন ও নবীকরণ ঘটায়—যখন আমরা 'কথামৃত' গ্রন্থখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করি। তখন সিদ্ধ সাধক কবি রামপ্রসাদের গানের ওই চরণটি মনে পড়ে যায়, ''কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে।'' শুধু 'নাচদুয়ারে' হাজির হতে হবে সাধককে ও সেগুলি তুলে আনতে হবে লোককল্যাণে বিতরণের জন্য—যেমন উপনিষদের ঋষিরা বলেছিলেন, যেমনটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব করেছেন এযুগে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদের একথাও জানিয়েছেন যে ''এখানকার (ওঁর নিজের) অনুভূতি বেদবেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে।'' এ কোনও অহমিকাজনিত বা অহংকৃত উক্তি নয়। একথা আমাদের ভাবতে শেখাচ্ছে যে সেই ব্রহ্মচৈতন্যসাগরের অনন্ত ভাবসম্পদের 'ইতি' করা যায় না। ঋষিদের ধ্যানে যে-সত্য revealed হয়েছে, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু ভাবরাশি তাঁর পবিত্র ধ্যানী হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে এবং তিনি তা ব্যক্ত করেছেন প্রসঙ্গক্রমে। মূল সত্য একটিই, বিভিন্ন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি তাকে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেন—''একং সৎ, বিপ্রা বহুধা বদন্তি।'' সুতরাং বলা যায় প্রেক্ষিত অনুযায়ী প্রকাশের তারতম্যে বা শব্দের সীমাবদ্ধতায় তা এক-একরকম হয়ে যায়। কিন্তু মননাত্মক বিশ্লেষণে যে সেই একই সত্য বা তত্ত্বে পৌঁছনো যাবে, তা তর্কাতীত। একই সর্বব্যাপী চৈতন্যসত্তায় একটিই শাশ্বত সত্য থাকবে, তবে যেমন বিশাল সমুদ্রের জলরাশি স্থানের বিভিন্নতায় ও প্রকৃতির খেয়ালে বিভিন্নরূপ তরঙ্গের আকার নেয়, তেমনি একই সত্য ভিন্নভাবে, ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশিত ও ব্যাখ্যাত হতে পারে যুগপ্রয়োজনে। সেই কাজ যাঁদের দ্বারা সাধিত হয়—যেমন শংকরাচার্য, রামানুজাচার্য, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণদেব প্রমুখ—তাঁদেরই 'যুগাবতার' বলা হয়ে থাকে।

'কথামৃতে'র আর একটি বাণীও আমাদের চমকিত ও মুগ্ধ করে, ভাব ও ভাষার প্রাঞ্জলীকরণ ও নবীকরণে। শ্রীরামকৃষ্ণ একসময় ব্রহ্ম, মায়া, জীবজগৎ এসবের প্রসঙ্গে বলছেন, ''জীবের অহংকারই মায়া''। এ যে কী আশ্চর্য clarification! জটিল ব্রহ্ম-মায়া-জীবজগৎ সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিকদের বাদ-প্রতিবাদের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের এই সংক্ষিপ্ত উক্তিটিকে সরলতম ও যথাযথ বলা

যায়, অর্থের প্রাধান্য বজায় রেখেই। 'মায়া' এখানে 'মমতা' নয়, 'ভ্রম' অর্থেই বুঝতে হবে। 'অহংকার' pride বা 'অহমিকা' অর্থে নয়—'অহং' বা 'আমি' ভাব—যে-'আমি' আমার সব পরিচয়ে, কাজে কর্মে, ব্যাবহারিক সম্পর্কে জড়িত। সেই individual বা ব্যক্তি 'আমি' আধ্যাত্মিক অর্থে 'ভ্রমযুক্ত আমি', illusory, যাকে বুঝতে গেলে, ধরতে গেলে মিলিয়ে যায় মিথ্যায়, অসত্যে, অসত্তায়। সাধনায়, প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে তার জায়গায় ধরা দেয় আত্মার বা চৈতন্যের 'আমি', 'বিশ্ব আমি'।

বেদান্তবাদী, মায়াবাদী আচার্য শংকরের 'মায়া' প্রসঙ্গে দার্শনিক তত্ত্বটি সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে এখানে, এবং তার সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের উক্তিটি তুলনামূলকভাবে উপস্থাপিত করেও দেখা যেতে পারে। আচার্য শংকর কেবলাদ্বৈতবাদী। তাঁর মতে ''ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য সত্তা সর্বব্যাপী, নির্গুণ নিরাকার, নিষ্ক্রিয় এবং সেই একমাত্র সত্য বা তত্ত্ব। জগৎ পরিবর্তনশীল বলে মিথ্যা। 'জগৎ' শব্দটির নিষ্পত্তিগত অর্থ হল গম ধাতু + জন্ + ড অর্থাৎ গমনশীল বা পরিবর্তনশীল। 'জীব' চৈতন্যাংশে ব্রহ্মস্বরূপই। তাই জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যে কোনও পার্থক্য নেই। জীবের শরীর, মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি সবই জড় এবং তা জড় বহিঃপ্রকৃতিরই অংশ।

প্রশ্ন ওঠে, পরিদৃশ্যমান জগৎ কীরকম মিথ্যা? শংকরাচার্য তিন প্রকার সত্তা মেনেছেন। প্রাতিভাসিক, ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক। এটি তাঁর সত্তাত্রৈবিধ্যবাদ রূপে খ্যাত। প্রাতিভাসিক সত্তা ক্ষণস্থায়ী, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। রজ্জুর জ্ঞান হওয়ামাত্র সর্পভ্রমের নিরসন হয়। কিন্তু ব্যাবহারিক সত্তা দীর্ঘস্থায়ী, যেমন জগতের জ্ঞান। চারপাশের এই বৈচিত্র্যময় জগৎ—মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, আত্মীয়পরিজন যাদের সঙ্গে নিত্য ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ও আমরা আবদ্ধ হয়ে পড়ি, তা দীর্ঘস্থায়ী ভ্রম। এর ব্যাবহারিক সত্যতা রয়েছে। জন্মজন্মান্তর ধরে এই 'ভ্রম' চলতে থাকে বলে এটি প্রাতিভাসিকের থেকে পৃথক কিন্তু ব্রহ্মের মতন পারমার্থিক সত্য বা চিরন্তন সত্যও নয়। শংকরাচার্যের মতে আমাদের এই 'ভ্রমের' কারণ 'আত্মজ্ঞানহীনতা' বা অজ্ঞানতা। এটিই তাঁর মতে 'মায়া'। রজ্জুর জ্ঞানে যেমন মিথ্যা সর্পভ্রম তিরোহিত হয়, তেমনিই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞানে ব্যাবহারিক 'আমি'র বা জগতের মিথ্যা বা ভ্রম দূরীভূত হয়। তবে তা সাধনসাপেক্ষ। সুতরাং আচার্যের মতে 'জগৎ' ব্রহ্মের মতন শাশ্বত সত্য না হলেও, 'আকাশকুসুমে'র মতনও সর্বৈব মিথ্যা নয়, কারণ আকাশকুসুম অবাস্তব, তাকে কল্পনাও করা যায় না।

শংকরাচার্যের মতবাদ অনুযায়ী ব্রহ্মসত্তা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, তিনি 'মায়া' উপাধি বা শক্তি অবলম্বনে জীবজগৎ সৃষ্টি করেছেন। মায়ার প্রকৃতি নির্ণয়ে তিনি বলেছেন, এ ব্রহ্মের মতন সত্য নয় আবার 'আকাশকুসুম', 'শশশৃঙ্গের' মতন একেবারে মিথ্যাও নয়। এটি 'সৎ'ও বটে, আবার 'অসৎ'ও বটে। তাই এর সংজ্ঞা দিয়েছেন—'সদসদ্‌ভ্যাম্ অনির্বচনীয়ম্'। অর্থাৎ একে শব্দ বা বাক্যবন্ধ দিয়ে নিরূপণ করা যায় না। আরও বলেছেন, এই মায়াশক্তি ব্রহ্মেই স্থিত, কিন্তু এর দ্বারা তিনি স্পৃষ্ট বা লিপ্ত নন। কীরকম? ঐন্দ্রজালিকের জাদুশক্তির মতন। জাদুকর তার জাদুশক্তি প্রয়োগে মানুষকে বিমোহিত করে, কিন্তু নিজে তার দ্বারা মোহিত বা প্রভাবিত হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিখ্যাত উপমা স্মর্তব্য : সাপের বিষে সাপের কিছু হয় না, কিন্তু সাপ যাকে কামড়ায় তার মরণ হয়। শংকরাচার্য আরও বলেছেন, মায়া-উপহিত চৈতন্যই ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ তিনিও 'মায়াস্পৃষ্ট'। আচার্য শংকরের শিষ্য

হস্তামলকের সূত্রে রয়েছে ঈশ্বর জীবচৈতন্যে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মসত্তা। সুতরাং ঈশ্বরও মায়া বা অজ্ঞানসৃষ্ট। কারণ জীবের জড় শরীর-মন-বুদ্ধি-চিত্তবৃত্তির ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে ব্রহ্মচৈতন্য স্বরূপজ্ঞান-রহিত হয়ে ভ্রমবশত শরীরের 'আমি' বা জীবের 'অহং'রূপে প্রকাশিত হয়; এবং এই অজ্ঞান মন বা 'আমি' শুদ্ধচৈতন্যসত্তাকে ধারণা করতে না পেরে তার স্থলে এক সগুণ সাকার ঈশ্বরের ধারণা করে বসে ওই প্রতিবিম্বিত সত্তাকে ধরে। স্বামীজী যেমন বলেছেন, যদি একটি বিশাল ষাঁড় তার ঈশ্বরকে কল্পনা করে তবে একটি বিশাল ষাঁড়ই কল্পনা করবে, তার বাইরে সে যেতে পারবে না। স্বামীজী জানিয়েছেন যে মানুষের মনে যতদিন দুর্বলতা থাকবে, অর্থাৎ জড় শরীর-মনের সঙ্গে একাত্মতা থাকবে এবং তজ্জনিত দুর্বলতা, ভয় ইত্যাদি থাকবে, ততদিন ঈশ্বরও থাকবেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও জানিয়েছেন উপমা দ্বারা : জলের কোনও আকার নেই, কিন্তু তীব্র হিমে সেই নিরাকার জলই যেমন সাকার বরফের রূপ ধারণ করে, তেমনি মানুষের ভক্তিহিমে নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্ম সগুণ সাকার ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হন;—'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'।

শংকরাচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদ পরবর্তীতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্যের দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে। তিনি 'মায়া'র অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। নির্গুণ ব্রহ্মে 'মায়াশক্তি' থাকতে পারে না, কারণ তাহলে ব্রহ্ম সগুণ হয়ে পড়বেন। আবার জীব মায়াসৃষ্ট, অর্থাৎ জীবের কারণ 'মায়া', সুতরাং 'কারণ' হিসাবে তার পৃথক পূর্ব অস্তিত্ব মেনে নিতে হবে। তাই রামানুজাচার্য প্রমাণ করে দিয়েছেন, 'মায়া'র কোনও Locus বা পৃথক স্থান নিরূপণ করা যায় না। তাই 'মায়া' অসিদ্ধ। তিনি 'জীবজগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম' স্বীকার করেছেন। ব্রহ্মের সজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ নেই ঠিকই, কিন্তু স্বগত ভেদ আছে। যেমন বৃক্ষের ক্ষেত্রে তার স্বগত ভেদ হল ফুল, ফল, শাখা, পল্লব, কাণ্ড ইত্যাদি ভেদ তেমনি 'ব্রহ্ম' একাকী সত্য নন, তিনি জীবজগৎবিশিষ্টভাবেই সত্য। তাই রামানুজাচার্যের ব্রহ্ম নির্গুণ নন—সগুণ, পুরুষোত্তম, বিষ্ণু বা নারায়ণ। ভক্তিবাদী রামানুজের মতে পুরুষোত্তম ভগবান নিজ লীলা আস্বাদনের জন্য নিজেই জীবজগৎ হয়েছেন। উপনিষদেই এর প্রমাণ রয়েছে। ঋষিদের উপলব্ধিতে এ-সত্য ধরা পড়েছে—''স ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়।'' আবার এটিও তাঁদের অপরোক্ষ অনুভূতি—''তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।'' তাই জীবকুল ও জড়জগতের মিথ্যাত্ব বেদানুগ নয়। বেদ অভ্রান্ত।

স্বামী বিবেকানন্দ 'মায়া'র সত্তা নিরূপণে বলেছেন ''It is a statement of fact''—আমাদের বর্হিজগতের যে-জ্ঞান হয়, তা বাচনিক, তা কখনই নিশ্চিত বা certain হয় না। কারণ 'মায়া' বা ভ্রমের মধ্যে থাকার জন্য ভ্রমজনিত জ্ঞানই হবে, তাকে পুরোপুরি অতিক্রম করা যাবে না মনবুদ্ধি সহায়ে। ঘটনা যা ঘটছে, তাকে বড়জোর বচনের মাধ্যমে বলতে পারি : এই বস্তু বা ঘটনা (fact) এই প্রকার দেখছি। পাশ্চাত্য দর্শনেও ভাববাদী দার্শনিকরা (Idealist) বহির্জগতের জ্ঞানের পূর্ণ সত্যতা স্বীকার করেননি। সংশয়বাদীদেরও এই মত যে, পূর্ণ জ্ঞান অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পাওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রদত্ত মায়ার সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা—'জীবের অহংকারই মায়া'—এক অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞার আলোকপাত। কত সহজ সরল অথচ যথাযথ। এ যেন তাঁরই ভাষায়, 'হাজার গাঁটের দড়ি এক ঝটকায় খুলে দেওয়া।' তিনি নিজেই একজনকে বলছেন খুঁজে দেখতে যে সে-'আমি ' বলতে ঠিক কাকে বোঝাচ্ছে। জানাচ্ছেন, পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে যেমন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি শরীরের বা মনের কোনও একটি অঙ্গ বা অংশের সঙ্গে এই যাকে 'আমি' বলছি, সে যুক্ত

নয়। শেষে যা পড়ে থাকবে তা ওই 'চৈতন্যের আমি', 'ব্রহ্মের আমি', 'তদাকারাকারিত আমি' (এখানে পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর পর আর পেঁয়াজ রইল না, শূন্য হয়ে গেল—এভাবে উপমিত হবে)। তাহলে যে-'আমি' নিয়ে আমি জগৎসংসারে পরিচিত হয়ে আছি, নামরূপের, বংশপরিচিতির মাধ্যমে, তা 'ভ্রম', illusory বা মিথ্যা। স্বামীজী শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলছেন তাঁর প্রশ্নের উত্তরে যে 'আমি'টাকে মারা বড় কঠিন—'' 'আমি' জিনিসটা কোথায় আছে, বুঝিয়ে দিতে পারিস? যে জিনিসটে নেই, তাকে আবার 'মারামারি' কি? আমিত্বরূপ একটা মিথ্যাভাবে মানুষ hypnotised (মন্ত্রমুগ্ধ) হয়ে আছে মাত্র।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আরও বলেছেন, সূর্যের উত্তাপে যেমন বরফ গলে গিয়ে আবার জলই হয়ে যায়, তেমনি আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সূর্যের উদয়ে এই 'আমি', 'সাকার আমি', 'মিথ্যা আমি'ও বিলীন হয়ে যায়। সাকার ঈশ্বরভাবনা নিরাকার চৈতন্যসত্তায় লীন হয়ে যায়। চৈতন্যের 'আমি' তাঁর ভাষায় সত্য, 'পাকা আমি', পূর্বেরটি 'কাঁচা আমি'।

আচার্য শংকর 'মায়া'কে 'অনির্বচনীয়' বলেছেন। রামানুজাচার্য মায়ার অস্তিত্ব স্বীকারই করেননি। স্বামীজী এ-ব্যাপারকে জাগতিক ঘটনার বিবরণ রূপে ব্যাখ্যা করেছেন, যার আপেক্ষিক সত্যতা আছে। অর্থাৎ সত্যও হতে পারে, আবার মিথ্যাও হতে পারে। 'মায়া'র এই সর্বপ্রকার ব্যাখ্যাই যুক্তিবিচারের অধীন, অর্থাৎ এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বিদগ্ধ শাস্ত্রবিদ বা পণ্ডিত বা প্রথাগত দার্শনিক না হয়েও 'মায়া'র মতো একটি রহস্যময় জটিল দার্শনিক তত্ত্বের যে এমনতর সহজ-সরল সমাধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা আমাদের চমৎকৃত না করে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণও দেহধারী মানুষকে ব্রহ্মস্বরূপের মর্যাদাই দিয়েছেন। বলেছেন, ''মানুষ কি কম গা, সে অনন্তকে চিন্তা করতে পারে!'' ''মাটির প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয়, আর মানুষে কি হয় না?'' তাঁর কাছে আগত নিম্নমানের নারীপুরুষের মধ্যেও তিনি ব্রহ্মশক্তি মা কালী 'উঁকি মারছেন' বলে দেখেছেন। তাঁর মতে ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। তাঁর উক্তি—'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে', অর্থাৎ নিজেরই সৃষ্ট দেহ-মন-ইন্দ্রিয়ের জালে পড়েই 'ব্রহ্মের' বৃহৎ 'আমি' প্রকাশিত হচ্ছে 'সীমিত' অহংরূপে এবং তাকেই সত্য মনে করে সংসারের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির আনন্দ-বেদনায় উদ্বেলিত হয়ে থাকে মানুষ, অথচ এ তার চিরসঙ্গী নয়।

কথামৃতেই পাই, কৃষ্ণের ওপর শ্রীরাধিকার অভিমান হয়েছে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে তিনি গেছেন বলে। তখন সখীরা তাঁকে বলছেন, ''তোর বড় অহংকার হয়েছে'' (অহমিকা অর্থে)। শ্রীরাধা উত্তর দিচ্ছেন, ''সখী, এ 'অহং' কার?'' এই উত্তরই বলে দিচ্ছে যে তিনি জানেন, তাঁর 'অহং' শ্রীকৃষ্ণেরই—সেই পরমচৈতন্যরূপী ব্রহ্মপুরুষের, যিনি লীলাবিলাসের জন্য তাঁর মধ্যে 'এ অহং' রেখেছেন। এতে শ্রীরাধিকার কোনও বন্ধন নেই, আসক্তি নেই।

জীবের যখন জ্ঞানলাভ হয়, তখন সে দেখে তার শরীর-মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি সবই জড়। তাতে আত্মচৈতন্যের আলো প্রতিবিম্বিত হচ্ছে মাত্র। তাদের নিজস্ব কোনও আলো নেই। ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 'চেতনার আরোহিণী' গ্রন্থে লিখেছেন, ''মন যেহেতু অচেতনের কোঠায় পড়ে, জড় প্রকৃতি থেকেই যখন তার সমুদ্ভব, তাই এ মনেরও (বাইরের প্রকৃতির মতই) কত অসংখ্য বিচিত্র রূপ, কত ছলা কলা রূপবদল।" যোগী, অধ্যাত্মপুরুষরাই চেতনার গভীরে ডুব দিয়ে মনের এই বহুরূপী ভাবের পিছনে, তাকে অতিক্রম করে, যে-প্রকৃত আমি বা স্থিতধী অহং আছে, যে-আত্মার 'আমি' তাকে ধরে ফেলেন এবং অখণ্ড শান্তি

আনন্দ লাভ করেন। রামকৃষ্ণদেবও বলেছেন, '' 'আমি' মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।'' তিনি দুই অর্থেই এই 'আমি'র কথা বলেছেন—এক আমার 'আমিত্ব', দুই আমার 'গর্বিত বা অহংকৃত ভাব'। প্রথমটি সাধারণভাবে নাম, রূপ, বংশগতি প্রভৃতি লৌকিক পরিচয়ে চিহ্নিত হয়, দ্বিতীয়টি 'আমি বিত্তবান, যশস্বী, পণ্ডিত' ইত্যাদির দ্বারা। ঠাকুরের মতে এ-দুটিরই কোনও নিজস্ব মূল বা শিকড় নেই, দুটিই মিথ্যা, মায়া বা ভ্রমমাত্র। এই 'আমি' পরিবর্তনশীল, সংকল্প-বিকল্পাত্মক, চৈতন্যময়ী 'আমি'-র ছায়ামাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন উপমা সহযোগে অপূর্বভাবে এই মিথ্যা খেলার 'আমি'কে ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন। যেমন জলের মধ্যে মাছেরা চাঁদের প্রতিফলিত ছায়া নিয়ে খেলছে, ভাবছে এটিই আসল চাঁদ। হাঁড়িতে ফুটন্ত জলে আলুপটল লাফাচ্ছে, মনে করছে তারাই নিজেদের শক্তিতে লাফাচ্ছে। কিন্তু হাঁড়ির তলা থেকে জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিলে তাদের লাফানো বন্ধ হয়ে যায়। আরও বলেছেন, বরাহ অবতারে জগতের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হয়ে ভগবান বিষ্ণু ছানাপোনা নিয়ে সংসার করতে গিয়ে নিজের দৈবী সত্তা ভুলে বসে রইলেন। তখন শিব এসে তাঁর শরীরটি ত্রিশূলের খোঁচা দিয়ে নষ্ট করে দেওয়ায় তাঁর হুঁশ হল ও তিনি হাসতে হাসতে দিব্যধামে চলে গেলেন। সুতরাং সত্যটি এই যে, জড় মনেতে প্রতিফলিত ব্রহ্মচৈতন্য ইন্দ্রিয়াদি ও তার বিষয়াদি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে 'স্থূল আমি'র আকার নেয় এবং সেটিই হয়ে যায় মায়ার সংসারের মূল চালিকা শক্তি। আচার্য শংকরের একটি অপূর্ব শ্লোক উদ্ধৃত করে ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় এই মায়িক 'আমি'র অসহায় অবস্থাটি বোঝাতে চেয়েছেন। ''নানাছিদ্রঘটোদরস্থিতমহাদীপপ্রভা-ভাস্বরং/ জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিঃস্পন্দতে।''—একটি মাটির কলসিতে অনেকগুলি ছিদ্র করে তারই মাঝখানে যদি একটি প্রদীপ বসিয়ে দিই, তাহলে তার দীপপ্রভা (প্রথমে কলসির ভিতরটিকে আলোকিত করে, অর্থাৎ প্রথমে মনের ওপর প্রতিফলিত হয়ে) ওইসব ছিদ্রপথে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পথে বাইরে ছড়িয়ে যায় ও তাদের বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের সঙ্গেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলে ও তদাকারাকারিত হয়ে যায়। এটিই অবিদ্যা, অজ্ঞানতা বা মায়া।

কথামৃতে দেখি ঈশান মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে, ''এই মায়াটি কি?'' তিনি উত্তর দিচ্ছেন, ''এই যা কিছু দেখছো, শুনছো, চিন্তা করছো—সবই মায়া।'' 'ব্রহ্মনামাবলী'তে আচার্য শংকর লিখেছেন, 'দৃশ্যা মায়েতি'। এর মধ্য দিয়ে পরবর্তীতে স্বামীজীকৃত মায়ার ব্যাখ্যাটি পরিষ্কার হয়ে গেল। জগতের সব জ্ঞানই বাচনিক জ্ঞান বা 'statement of fact',—যা কিছু দেখছি, শুনছি এবং তা নিয়ে চিন্তা করছি, বাক্যে তারই প্রকাশ ঘটাচ্ছি—এসবই আপেক্ষিক জ্ঞান, সত্য-মিথ্যা মেশানো, 'সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য' জ্ঞান, কারণ এসব জ্ঞান যা দিয়ে আহরণ করছি, সেই মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি যন্ত্রগুলি সবই মিথ্যা, মায়ার সৃষ্টি। আবার শংকরাচার্যের মায়ার তত্ত্বটিও—'অনির্বচনীয়ত্ব'ও এখানে স্বীকৃতি পেল, কারণ এসব জ্ঞান সত্যও বটে, মিথ্যাও বটে, সাময়িকভাবে, ব্যাবহারিকভাবে, বাস্তবক্ষেত্রে সত্য বটে, কিন্তু পরমার্থত মিথ্যা, অর্থাৎ চিরন্তনভাবে সত্য নয়।

আবার রামকৃষ্ণদেব রামানুজাচার্যের ভক্তিবাদ স্বীকার করে ঈশ্বরকেও ব্রহ্মসত্যের সমানুপাতিক করে দিয়েছেন এই উপলব্ধিতে যে, ভক্তিহিমে নিরাকার জলরূপ ব্রহ্ম সাকার বরফাকৃতি হয়ে যায়, আবার আত্মজ্ঞান-সূর্যের উদয়ে তা নিরাকারেই পরিণত হয়, দুই-ই অবস্থাভেদে সত্য।